

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা



মৈত্রী-সংযোগ সোসাইটি

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা- ১৪৩০

প্রকাশকাল- ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩

নিবেদক- মৈত্রী-সংযোগ সোসাইটি

প্রচ্ছদ- মনজিত নন্দী

বর্ণস্থাপন, অলংকরণ ও মুদ্রণ- নেট ফড়িং

Website: www.moitrisanjog.in

Email: moitrisanjog2011@gmail.com

Whats app: 7063418696

মৈত্রী-সংযোগ সোসাইটি কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

নেট ফড়িং, ২০২৩

©2023 Moitri Sanjog Society, Inc. All rights reserved.

গ্রন্থস্বত্ত্ব- মৈত্রী-সংযোগ সোসাইটি

নেট ফড়িং এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই এর কোন অংশেরই পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক মাধ্যম অর্থাৎ তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে কপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Mariwala Health Initiative

Dibakar Biswas

Ani Dutta

সূচীপত্র

- ❖ মৈত্রী-সংযোগের কলমে- ৫
- সামাজিক লিঙ্গ বিভাজন এবং লিঙ্গ পরিচয়ের বৈচিত্র্যঃ কিছু ভাবনা-
অনিরুদ্ধ দত্ত- ৭
- যৌনতা ও সমকামিতা বিষয়ে কিছু ধারণা, সংজ্ঞা ও শব্দের অর্থ- ২০
- সমকামিতা সম্পর্কে যা জানতে চান- ২৭
- প্রান্তিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন- অনুপম মিত্র- ৩৪

মৈত্রী সংযোগের কলমে...

২০ বছর হ্যাঁ ২০ বছর কেটে গেল, এই নতুন জীবনের। একটা জীবন থেকে আর একটা জীবনে পদার্পণ করার। অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যেমন ক'দিন আগেই তো স্কুলে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম, প্রায় দিনের পর দিন অনুপস্থিত হয়ে থাকতাম। কেন জানেন ভয় পেতাম সারা ক্লাস তো হেসে উঠবে আমি 'ইয়েস স্যার', 'ইয়েস ম্যাম' বললেই। কারণ আমি শরীরে পুরুষ হয়েও আমার গলার স্বর ছিল একজন মহিলার মতো কোমল সরু আমার ভেতরে ছিল এক নারীসত্তা। আবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারিনি কারণ 'এই লেডিস', 'এই বৌদি', 'এই ছক্কা' শব্দ শুনতে হবে বলে। এই করেই অনেকগুলো বছর পার করে দিলাম, আজ এক নতুন জীবনের পথে আমি। বলতে পারেন নিজেকে পাঁলেট ফেলা জীবন। এ এক দুর্বিষহ জীবন থেকে উত্তরণের দিকে যাবার জীবন। যদিও ভেবেছিলাম এ পথ হয়তো কোমল, এ পথ হয়তো মসৃণ কিন্তু অন্তর্যামী হয়তো অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। কোনো পথ যে মসৃণ হয় না সেটাই তিনি বুঝিয়েছিলেন। প্রথম দিকে টোন-টিটকারীগুলো ভাগে-ভাগে শুনতাম একটা সময় 'লেডিস' একটা সময় 'ছক্কা', 'বৌদি', 'গে' ইত্যাদি। আবার এই জীবনে এসে নিজের আত্ম-পরিচয়টাই কেমন যেন গুলিয়ে গেল আমি নিজেকে একজন রূপান্তরকামী নারী মনে করলেও সমাজ আমাকে অন্য নামে ডাকতে শুরু করলো। একটা প্রচলিত শব্দ 'হিজড়ে' কিন্তু আমি যে শুনে এসেছি হিজড়ে একটা পেশা গত নাম বা হিজড়ে একটা রীতি-নীতির চল তবে আমি কেন সেই নামে ভূষিত হবো। আমি সমস্ত পেশাকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি নিজে তো সেই পেশার অংশীদার নই। সেই থেকেই ঠিক করলাম কোনো দিন হয়তো এই বিভাজন নিয়ে লিখবো, এই বিভাজন নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো। শুরু করলাম সেই পথ চলা যার নাম মৈত্রী সংযোগ পরিবার। যার মূল কাজ প্রান্তিক মানুষদের নানা বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো তাদের আত্মার সহায়ক হওয়া। সেই পথ খুব মসৃণ ছিল সেটা বলবো না ওই যে বলেছিলাম কোনো পথই কোমল হয় না। মাঝে কাজটা কিছুটা পিছিয়ে গেল কারণ আমাদের সবার জীবনে এলো ভয়াবহ করোনা ভাইরাস। জীবনের মূল্যবান কাজ অনেকগুলো দিন পিছিয়ে দিল। তারপর আবার কাজে ফেরা ভাবলাম কিভাবে আমাদের মতো মানুষদের আরো সচেতনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই করোনার সময় ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা মনে নাড়া দিতে শুরু করলো, মানসিকভাবে

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা

আমরা কতটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে দিন কাটাই সেটা করোনা না এলে হয়তো বোঝা যেত না। বারবার একটি কথা আমি বলেছি, কমিউনিটির মানুষের জীবনে কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে শুধু মাত্র যৌন-স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাদের সামাজিক অধিকার এবং জেনারেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমার তো মনে হয় এই কমিউনিটিকে ডবল স্টিগমাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই HIV Project এর নাম করে। আমরা এরপর শুরু করলাম গোঁড়া থেকে কাজ করা বাচ্চাদের শিক্ষা নিয়ে। এর মূল কারণ হলো ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা যে জীবনের শুরুতেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি অন্ধকার জীবনের দিকে চলে যায়। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার মূল কারণ তাদের জেন্ডার আইডেন্টিটি। খুব দুঃখজনকভাবে হলেও মেয়েরাও বোঝে না, ছেলেরাও বন্ধু হয় না এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সাথ দেয় না। তবে কি ব্যতিক্রম নেই? অবশ্যই আছে এবং থাকবেই। আমাদের লক্ষ্য আমরা যে বাচ্চাদের সাথে যুক্ত আছি তাদের মধ্যে থেকে যদি দু'জনও বড় হয়ে তার কোনো সহপাঠি যদি LGBT কমিউনিটির মানুষ হয় এবং তাকে বোঝে সেটাই আমাদের সার্থকতা।

আমরা আশা রাখছি এই বই আপনারা পড়বেন এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেবেন। কাজ চলবে, কথা এগোবে, সমাজ পরিবর্তন হবেই, আমরা সবাই মিলে সমাজ-কে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

-অরিন্দম দাস (সুমি)

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মৈত্রী-সংযোগ সোসাইটি এবং একজন সচেতন আন্দোলন কর্মী
কোচবিহার, উত্তরবঙ্গ

সামাজিক লিঙ্গ বিভাজন এবং লিঙ্গ পরিচয়ের বৈচিত্র্য: কিছু ভাবনা অনিরুদ্ধ দত্ত

ভূমিকা-

রূপান্তরকামী, সমকামী, কোতি, হিজড়ে এবং অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষদের প্রতি আমাদের সমাজে একটি ঘৃণা মিশ্রিত কৌতূহল কাজ করে। এরা কি, কোথা থেকে এল, কেন বা কিভাবে এমন হল? আমরা ভেবে থাকি বা আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে শিখি, যে যেই লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন আচরণ-কে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অর্থাৎ যৌনাসঙ্গের ভিত্তিতে নির্ধারিত ‘পুরুষ’ ও ‘নারী’ পরিচয় এবং পুরুষ-নারীর মধ্যে বিষমকামী প্রেম, সেগুলোই ‘স্বাভাবিক’ এবং চিরাচরিতভাবে চলে আসছে। বাকি সব কিছুকে ব্যতিক্রম বা এমনকি অস্বাভাবিক বলেও ভাবা হয়, যদিও বহু যুগ ধরে বহু মানুষ রয়েছেন যাদের অবস্থান উপরোক্ত লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের ছকের বাইরে।

সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণ অনুযায়ী সাধারণত লিঙ্গ পরিচয়কে ‘পুরুষ’ বনাম ‘নারী’ এই দুটি খোপ বা ছকে ভাগ করা হয়ে থাকে, যাকে বলা যেতে পারে লিঙ্গের দ্বৈত-বিভাজন বা দ্বিমেরুকরণ (gender binary)। এই কাঠামো অনুযায়ী ‘পুরুষ’ এবং ‘নারী’ এই দু’টি পরিচয় বর্গগুলিকে একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে কল্পনা করা হতে পারে, আবার আরেকটু ইতিবাচক অর্থে একে অপরের পরিপূরক হিসেবেও দেখা যেতে পারে। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম বা অসম, ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, সাধারণত এই দু’টি বর্গ কঠোরভাবে আলাদা হিসেবেই ভাবা হয়ে থাকে- যে ‘নারী’ সে ‘পুরুষ’ নয়, যে ‘পুরুষ’ সে ‘নারী’ নয় এবং হতে পারবে না। অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন যে এই বিভাজনটি চিরস্থায়ী এবং প্রাকৃতিক বা ভগবানপ্রদত্ত। তাই জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই শুধুমাত্র কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি চিরকালীন পরিচয় আরোপ করে দিতে দ্বিধা বোধ করে না সমাজ, এবং সেই আরোপিত পরিচয় অনুযায়ী আদর্শ ‘পুরুষ’ বা ‘নারী’ হয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন বিধিনিষেধও ঠিক করে দেয়। অতএব ‘নারী’ ও ‘পুরুষ’ এই দুই বর্গের মধ্যে যাতায়াত বা রূপান্তর করতে চাইলে তা সহজে সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয় না এবং এই দ্বৈত বিভাজনের বাইরে অন্য কোনো ‘অন্য’ বা ‘তৃতীয়’ লিঙ্গ অবস্থানও সহজে মান্যতা পায় না- অনেক লড়াই এর পরেই হয়তো বা খানিক স্বীকৃতি মেলে।

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা

শারীরিক লিঙ্গ-চিহ্নের ভিত্তিতে আরোপিত সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে যাদের মানসিক লিঙ্গ ঠিক মেলে না বা যাদের চালচলন, পোশাক-আশাক, শারীরিক গঠন বা যৌন আচরণ লিঙ্গের দ্বৈত বিভাজনকে লঙ্ঘন করে, তারা সাধারণত আমাদের জনমানসে একটা ‘সমস্যা’ হিসেবেই দেখা দেয়। ‘ছেলে’ বা ‘মেয়ের’ সামাজিক ভূমিকা থেকে অল্প কিছু হেরফের হয়তো সহ্য করা যায় বা বাল্যকালের সাময়িক বিকার বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে (১)। কিন্তু তার বেশী কিছু হলেই নিরন্তর প্রশ্ন- ছেলেটা ওরকম মেয়েলি কেন? মেয়েটার তো বড় ছেলে-ছেলে ভাব! মেয়েদের জামাকাপড় পরেছে কিন্তু শরীরটা কেমন ছেলেদের মতন- ওর প্যাণ্টের তলায় কি আছে রে? স্কুলে বা পাড়ার খেলার মাঠে খ্যাপানো, রাস্তাঘাটে টোন-টিটকারি, এমনকি সংশোধনমূলক ধর্ষণ পর্যন্ত তাদের- মানে আমাদেরই মধ্যে অনেকের- কপালে বরাদ্দ থাকে। তার ওপর সে যদি নিম্নবিত্ত বা দলিত শ্রেণীর হয় তাহলে তো কথাই নেই। লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের সংযুক্ত প্রকোপ তাকে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর করে দেয়। একদিকে উচ্চশিক্ষা বা সাধারণ কোনো চাকরির রাস্তা বন্ধ বা চূড়ান্তভাবে সীমিত হয়ে যায়, আবার অন্যদিকে যদি সে বিকল্প কোন রোজগারের ব্যবস্থা যেমন যৌন-কর্ম বা হিজড়ে প্রথা অবলম্বন করে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তার কপালে জোটে সামাজিক গঞ্জনা ও পুলিশের লাঠি। এই ধরনের বৈষম্যমূলক মনোভাব গোঁড়া থেকে বোঝার এবং অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে আমি প্রথমে লিঙ্গ ও যৌনতার বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণার পর্যালোচনা করব, এবং তারপর আমাদের সমাজে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের বৈচিত্রের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কিছু গোঁড়ার কথাঃ শারীরিক লিঙ্গ (sex), লিঙ্গ পরিচয় (gender), যৌনতা (sexuality)

আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে শারীরিক লিঙ্গ (sex), লিঙ্গ পরিচয় (gender), যৌনতা (sexuality, sexual orientation), প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা বিষয়। শারীরিক লিঙ্গ বা sex বলতে এক ধরনের দৈহিক বিভাজন বোঝানো হয়- শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা যেভাবে ছেলে-মেয়ে বা পুরুষ-নারীর পার্থক্য করে থাকি। অনেকেই এই শারীরিক বিভাজনকে একটি জৈবিক সত্য বা biological fact ভাবেন। অথচ, সেটাও কিন্তু আদতে কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সামাজিক চিহ্নিতকরণ বা social libelling: অর্থাৎ, আমরা কিন্তু আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ‘পুরুষের অঙ্গ’ নাকি ‘নারীর অঙ্গ’ সেই বোধ নিয়ে জন্মাই না, বরং বাহ্যিকভাবে আমাদের শরীরের কিছু লক্ষণকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। আমাদের সমাজ আমাদের শরীরের কিছু বৈশিষ্ট্যকে

প্রজন্মের নির্ধারিত ভূমিকা অনুযায়ী ‘পুরুষ যৌনাঙ্গ’ বা ‘নারী যৌনাঙ্গ’ বলে চিহ্নিতকরণ করে (২)। কিন্তু শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং এমনকি যৌনাঙ্গেরও সেই অর্থে কোন অন্তর্নিহিত লিঙ্গ নেই, যেহেতু প্রজন্ম ছাড়াও সেগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায় এবং নানা নাম দেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কিছু সামাজিক পুরুষ তাঁদের যৌনাঙ্গকে নানা রকম পৌরুষসুলভ নাম দেন। আবার পক্ষান্তরে, প্রান্তিক লিঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্য এবং গবেষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেক রূপান্তরকামী নারীরা (অর্থাৎ পুরুষ-থেকে-নারী রূপান্তরকামীরা) বা মেয়েলি পুরুষেরা কিন্তু সেই একই অঙ্গ কে ভিন্ন চোখে দেখতে পারেন, তাদের শিল্পকে ‘লম্বা যোনি’ বা ইংরেজিতে ‘long clitoris’ (যোনির উপরিভাগের ভগাংকুর) বা এই ধরনের কোন নামে অভিহিত করতে পারেন। এবং শিল্প ও ভগাংকুরের মধ্যে একটি জৈবিক সংযোগ আছে সেটাও ঠিক, যেহেতু ঋণের বিকাশের সময়ে তাদের একই অঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়- অর্থাৎ জৈবিক দিক থেকে দেখলেও শারীরিক লিঙ্গ দুটো বিপরীত-ধর্মী বর্ণে বিভক্ত নয়। অতএব একই যৌনাঙ্গের অনেক রকম লিঙ্গায়ন হতে পারে, যদিও সব লিঙ্গায়নকে সমাজ একইভাবে স্বীকৃতি দেয় না! আর তার ওপর বিভিন্ন রকমের intersex (অন্তর্লিঙ্গ বা আন্তঃলিঙ্গ) মানুষ রয়েছেন, যাদের যৌনাঙ্গ প্রাকৃতিক কারণেই ‘পুরুষ’ বা ‘নারী’ যৌনাঙ্গ হিসেবে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

আবার লিঙ্গ পরিচয় মানসিক প্রবণতা ও আত্মপরিচয়ের ব্যাপার, অর্থাৎ শারীরিক লিঙ্গ থেকে আলাদা। উপরন্তু, উপরে যেমন দেখলাম, ‘শারীরিক লিঙ্গও’ শুধুমাত্র জৈবিক নয়, বরং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সামাজিক চিহ্নিতকরণ। অতএব কোন মানুষ তাঁর শারীরিক লিঙ্গ-চিহ্ন বোনা বদলেও, শারীরিক রূপান্তর না করতে চাইলেও, মানসিকভাবে।

ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয় এর অধিকারী হতেই পারেন। যেমন কেউ তথাকথিত ‘পুরুষ’ লিঙ্গ- চিহ্ন নিয়েও নারী বা অন্য বৈকল্পিক লিঙ্গ পরিচয় ধারণ করতে পারেন, এমনকি বিয়ে- সংসার করেও রূপান্তরকামী হতে পারেন।

এক্ষেত্রে তাঁর শারীরিকভাবে মহিলা হওয়ার প্রবণতা আছে কি নেই সেই প্রশ্ন অবাস্তব, যেহেতু তিনি তাঁর শরীর বা যৌনাঙ্গ নিয়ে কি করতে চাইছেন বা চাইছেন না, সেটা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া, অনেক জন্মসূত্রে পুরুষ-চিহ্নিত প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ নিজেদের মহিলা না মনে করে তৃতীয় লিঙ্গ, ভিন্ন লিঙ্গ, মিশ্র লিঙ্গ, মেয়েলি পুরুষ, ইত্যাদি অনেক কিছুই মনে করতে পারেন (৩)। কারুর মানুষের লিঙ্গ পরিচয় ‘পুরুষ’ না হলেও তারা ‘পুরুষ’ যৌনাঙ্গ নিয়েই সুখী হতে পারেন (যেমন আমি

নিজে, এবং আমার অনেক রূপান্তরকামী বন্ধু, যাদের নাম এখানে করছি না কিন্তু যাঁরা যৌনাস্থের রূপান্তর করাতে চান না)। যেহেতু যে কোন মানুষের লিঙ্গ পরিচয় তাঁর মানসিক পরিচিতি, তার শরীরের সামাজিক চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে তাঁর উপর কোন লিঙ্গ পরিচয় আমরা বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারি না। বা যদি চাপিয়ে দিই, তাহলে সেই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক নিয়মাবলীরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ২০১৪ সালের ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ‘নালশা’ রায় কিন্তু ঠিক এই লিঙ্গ স্ব-নির্ধারণের অধিকারের কথা বলেছে। সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়ে বলা আছে যে লিঙ্গ স্বনির্ধারণের জন্যে শারীরিক রূপান্তরের কোনও অবশ্যকতা নেই- কোন ট্রান্সজেন্ডার মানুষ, অর্থাৎ রূপান্তর কামি বা প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ যার মানসিক লিঙ্গ পরিচয় তাঁর সমাজ-আরোপিত লিঙ্গ পরিচয় থেকে আলাদা, তিনি তাঁর মানসিক পরিচয় এর ভিত্তিতেই তাঁর লিঙ্গ নির্ধারণের অধিকার রাখেন।

শারীরিক লিঙ্গ ও লিঙ্গ পরিচয়ের আসি যৌনতার প্রসঙ্গে। এখানে উল্লেখ্য, লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন পছন্দ দুটি আলাদা বিষয়, অর্থাৎ লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তির ভিত্তিতে যৌন পছন্দ ধার্য করা যায় না এবং যে কোন মানুষের মধ্যে লিঙ্গ ও যৌনতার বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণ বা combination থাকতে পারে। যেমন কোন পুরুষ সামাজিক দৃষ্টিকোণে ‘পুরুষালি’ হলেও নারীসঙ্গ নাও চাইতে পারেন, বরং ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পারেন। ঠিক তেমনি, কোন রূপান্তরকামী নারী (অর্থাৎ পুরুষ-থেকে-নারী রূপান্তর কামি), মেয়েলি পুরুষ, বা কতি (মেয়েলি) মানুষ যেমন পুরুষদের পছন্দ করতে পারেন, তেমনি নারীদেরও পছন্দ করতে পারেন- এটি একটি ব্যক্তি সাপেক্ষ বিষয়।। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত মার্কিন ক্রিয়াবীদ কেটলিন জেনারের কথা বলা যেতে পারে, যিনি কিছু বছর আগে রূপান্তরকামী মহিলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি এ যাবত নারীদের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন এবং সেই সম্পর্কগুলি থেকে তাঁর একাধিক সন্তানও রয়েছে। ঠিক তেমনভাবে, কোন রূপান্তর কামি পুরুষ (নারী-থেকে-পুরুষ রূপান্তরকামী ব্যক্তি) যে নারীদেরই সঙ্গী হিসেবে চাইবেন, সেরকম কোনো কথা নেই-তিনি পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরও যৌন সঙ্গী হিসেবে চাইতে পারেন।

আমাদের সমাজ লিঙ্গ-চিহ্ন, যৌন-আচরণ এবং লিঙ্গ-পরিচয় মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের ধারণা তৈরি করে, আমাদের শেখায় যে লিঙ্গ-চিহ্ন, যৌন-আচরণ এবং লিঙ্গ-পরিচয় একে অপরের পরিপূরক, একটার ভিত্তিতে আরেকটা নির্ধারিত হওয়া উচিত। মানে যদি কারো পুরুষ যৌনাস্থ থাকে তার মানসিক ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় পুরুষ হবে এবং সে নারীদের প্রতিই আকৃষ্ট হবে। এই লিঙ্গ নির্মাণ অনুযায়ী ভাবা হয় যে রূপান্তরকামী মানুষদের কোনো ভাবে ‘ভুল শরীরে’ জন্ম হয়ে গেছে। যেমন কেউ

শরীরে ‘পুরুষ’ হয়েও মনে নারী, সে তার শারীরিক লিঙ্গ-চিহ্ন বদলাতে চায় এবং পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাতে সামাজিক ধারণা অনুযায়ী আবার লিঙ্গ-চিহ্ন, মানসিক পরিচয় এবং যৌন আচরণের ‘সামঞ্জস্য’ ফিরে আসে। কিন্তু কেউ যদি শরীর না বদলিয়েই ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয় ধারণ করেন, বা প্রত্যাশিত যৌন আচরণ না করে অন্য ধরনের যৌন আচরণ করেন, তাহলে সেই মানুষদের বোঝা বা মেনে নেওয়াটা অনেকের পক্ষেই আরেকটু কঠিন হয়ে পড়ে, যেহেতু লিঙ্গ সামঞ্জস্যের ধারণা অনুযায়ী তাদের পরিচয় ঠিক ছকের মধ্যে ‘খাপ’ খাওয়ানো যায় না।

এই লিঙ্গ সামঞ্জস্যের ধারণার উপরেই প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন আছে। কি ঠিক করে দেয় যে একটা ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে একটা ধরনের সাজ পোশাক এবং সামাজিক পরিচয় খাপ খাওয়াতে হবে? আমাদের মধ্যে পুরুষত্ব নারীত্বের এবং শরীর-মন-পোশাক-আচরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ কেন থাকতে পারবে না? কেন বলা হবে যে কিছু কন্সনেশন ঠিক এবং বাকিগুলো ‘ভুল’? এখানে যে রূপান্তরকামী মানুষেরা শারীরিক রূপান্তর করতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইছি না। কেউ তার নিজস্ব লিঙ্গ ধারণা অনুযায়ী নিজের পরিচয় পূর্ণতা অর্জনের জন্য শারীরিক রূপান্তর চাইতেই পারেন। সমস্যাটা হয় যদি শারীরিক রূপান্তরের আবশ্যিকতা সব প্রান্তিক বা বৈকল্পিক লিঙ্গের মানুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, বা যদি শারীরিক রূপান্তর না করলে তাঁদের পরিচয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

হিজড়ে গোষ্ঠী ও পরিচিতি-

আমাদের সমাজে পুরুষ-নারী ছকের বাইরে প্রান্তিক বা ভিন্ন কোন লিঙ্গ পরিচয়ের কথা উঠলে প্রথমেই যাদের কথা বলা বা ভাবা হয়, তাঁরা হলেন হিজড়ে গোষ্ঠী বা পরিচয়ের মানুষেরা। আমাদের দেশে হিজড়া নামক যে গোষ্ঠী ও উপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ যোগদান করেন। যদিও পুরনো চলতি ধারণা হলো যে তাঁরা সবাই জন্মসূত্রেই ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ বা অন্তর্লিঙ্গ, এখন এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে যার থেকে আমরা জানি যে এই গোষ্ঠীর মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জন্মের সময় অন্তর্লিঙ্গ বা intersex হিসেবে চিহ্নিত হন (যাদের যৌনাঙ্গ ঠিক পুরুষাঙ্গ বা যোনি বলে চিহ্নিত করা যায় না)। তুলনায় বেশিরভাগই জন্ম সূত্রে ‘পুরুষ’ হিসেবে চিহ্নিত হন (৪)। কিন্তু জন্মসূত্রে তাঁরা যেভাবেই চিহ্নিত হন না কেন, লিঙ্গ-চিহ্ন নির্বিশেষে তাঁরা নিজেদের পরিচিতি মহিলা, তৃতীয় লিঙ্গ, বা ভিন্ন লিঙ্গ হিসেবে দিতে পারেন। রাস্তা-ঘাটে যে হিজড়ি পেশায় নিযুক্ত মানুষদের দেখা যায়, তাঁরা অনেকেই তাঁদের শারীরিক লিঙ্গ-চিহ্ন পরিবর্তন করেননি বা করতে পারেননি, হয়

অর্থাভাব বা সুযোগের অভাবে নয় কারণ তাঁরা সেটা করতে চান না। (আগেই বলছি যে কারো মানসিক লিঙ্গ পরিচয় ‘পুরুষ’ না হলেও তাঁরা ‘পুরুষ’ যৌনাঙ্গ নিয়ে সুখী হতে পারেন)। এরকম বহু মানুষের সাথে আমার পরিচিতি আছে যাঁরা তথাকথিত শারীরিক ‘পুরুষত্ব’ বজায় রেখেও হিজড়ে বা রূপান্তরকামী নারীর পরিচয় ধারণ করেন- কিন্তু প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই সেই পরিচিতি ধারণ করার পেছনে শুধু জীবিকা নয়, তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের ও ভূমিকা থাকে। হিজড়ে পেশার সাথে যুক্ত আমার এক বান্ধবীর কথায়, “কেউ যদি মনের দিক দিয়ে ‘টোল্লা’ [অর্থাৎ পুরুষ] হয়, সে তো এই কাজটা করে উঠতে পারবে না। আমাদের ঘরের বাবারা বা দাদারা কি এই কাজটা করতে পারবে?” অর্থাৎ, হিজড়ে পরিচয় ধারণ করার জন্য শুধু জীবিকা নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা মানসিক প্রস্তুতিও লাগে, যেটা রূপান্তরকামী বা বৈকল্পিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব হয়ে থাকে।

কোতি, মেটি, নুরানি, জেনানা-

ট্রান্স বা প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে হিজড়ে পরিচিতি ছাড়াও কোতি, মেটি, নুরানি, জেনানা, ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচয় আছে, যেগুলো মেয়েলি পুরুষ ও রূপান্তরকামী নারীসহ একটি বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী কে বোঝায়। যদিও ‘কোতি’ বা ‘জেনানা’ জাতীয় শব্দগুলি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, তাদের বৃহৎ অর্থ হল এমন মানুষ যাঁরা ১) জন্মসূত্রে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত এবং ২) লিঙ্গ পরিচয় অনুযায়ী নিজের মেয়েলী, নারী, আর রূপান্তরকামী হিসেবে দেখেন এবং ৩) শারীরিক রূপান্তর করতে চাইতেও পারেন, আবার নাও চাইতে পারেন (৫)। ‘কোতি’ শব্দটি বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতে নিম্নবিভক্ত প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে ‘জেনানা’ কথাটি হিন্দি বা উর্দুভাষী অঞ্চলে (যেমন লক্ষ্ণৌ বা দিল্লি শহরে) বেশি ব্যবহৃত হয়, ‘মেটি’ কথাটির প্রচলন উত্তরবঙ্গ এবং নেপালের প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই কথাগুলি সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যেমন অনেক গোষ্ঠী সদস্যের মুখে শুনেছি, ‘আমরা কোতি- জেননা মানুষ’ বা ‘আমরা কোতি-জেনানির জাত’। জেনানা বা কোতিরা হিজড়ে সংস্কৃতির রীতি রেওয়াজ মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে হিজড়ে গোষ্ঠী ও পেশায় যোগদান করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন- অনেকেই হিজড়ে গোষ্ঠীর বাইরে থাকেন।। যাঁরা যোগদান করেন তাদের আকুয়া হিজড়া বলা হয়ে থাকে, যতদিন না তারা লিঙ্গচ্ছেদন করছেন; যদি লিঙ্গচ্ছেদন করান তাহলে তাদের নির্মাণ হিজড়ে বলা হয় (৬)।

এই গোষ্ঠীদের প্রবীণ সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জেনেছি, বাংলায় কোতি শব্দটির প্রচলন খুব পুরনো নয়। নব্বইয়ের দশকের আগে ‘কোতি’ শব্দটির সাথে তাঁরা অনেকেই পরিচিত ছিলেন না- বরং সেই সময় তাঁরা যে শব্দটি ব্যবহার করতেন সেটি হল ‘ধুরানী’। এই ধুরানী শব্দের অর্থ বৃহৎ, পরিপ্রেক্ষিতে অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। একজন সমকামী সমাজকর্মীর মুখে শুনেছিলাম যে তিনি আশির দশকের শেষের দিকে দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে (রবীন্দ্র সরোবরে) ঘুরতে গিয়েছিলেন, শুনেছিলেন সেখানে মেয়েলি পুরুষদের সমাগম হয়। সেখানে একজন তাঁকে দেখে ডাকেঃ “এই ধুরানী!” পরে তিনি ধুরানীর মানে জিজ্ঞেস করতে সে বলে, “মানে যারা মুখে নেয়, পোঁদে নেয়!” তিনি বলেন, “কিন্তু আমি তো নেই না!” সে তখন বলে, “আরে যারা একটু মেয়েলি-মেয়েলি, নেচে-নেচে চলে!” তিনি বলেন, “কিন্তু আমি তো ওরকমও না!” শেষে অপরজন বলে, “আরে, আমাদের সাথে যাদের খুব খাতির, তারাই ধুরানী!” হিজড়ে এবং অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গের গোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা উল্টাইত এ “ধুরানো” কথাটির মানে যৌন সঙ্গম করা, সেই অর্থ অনুযায়ী অনেককে বলতে শুনেছি যে ধুরানী মানে যৌনকর্মী বা যে অতিরিক্ত যৌন সঙ্গম করে বেড়ায়। কিন্তু আশি নব্বইয়ের দশকে অনেক প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের কাছে ধুড়ানির অর্থ আরো অনেক বৃহৎ ছিল- একটু সরলীকৃতভাবে হয়তো বলা যায়, মেয়েলি পুরুষ, রূপান্তরকামী নারী, এবং তৃতীয়/ভিন্ন লিঙ্গ ও যৌনতার ব্যক্তিত্বের একটি সম্মিলিত জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ও আত্মপরিচয়। ২০১৩ সালে একটি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের এর বিখ্যাত ট্রান্স ব্যক্তিত্বের (নামটি না হয় উহাই থাক) মুখে ধুরানী সমাজের একটি প্রবাদ শুনেছিলামঃ “এই ধূসর পৃথিবীতে আমরাই তো রানী, তবেই না বলে ধুরানী!”

নব্বই দশকের শেষের দিক থেকে ‘ধুরানী’ কথাটির পরিবর্তে ‘কোতি’ শব্দটি এই গোষ্ঠীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যার জন্য কিয়দাংশে দায়ী ছিল তখনকার নবাগত এনজিও বা বেসরকারি সংগঠনদের পরিভাষা, যেখানে এইচ-আই-ভি সংক্রমণের জন্য একটি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য ‘কোতি’ কথাটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এনজিওদের আগমনের আগেই পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয় এর মানুষেরা ‘কোতি’ কথাটির সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং পরিচিতিটিকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পশ্চিমবাংলায় আনতে সাহায্য করেছিলেন। যেমন, উত্তর কলকাতার ধুরানী গোষ্ঠীর মধ্যে একজন মধ্যমণি ছিলেন বাপ্পাদা, যিনি দুর্ভাগ্যবশত ২০২২ সালে প্যানডেমিকের সময় মারা যান। ২০১৩ সালে একদিন নানা আলোচনার মধ্যে বাপ্পাদা আমায় বলেছিলেন যে তিনি আশির দশকে দিল্লি বেড়াতে গিয়ে ওখানকার গোষ্ঠীদের মধ্যে ‘কোতি’ কথাটি শোনেঃ ‘আমি ফিরে

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা

এসে বন্ধুদের বললাম, জানিস, দিল্লিতে ধুরানীদের কোতি বলে আর পারিখদের (পুরুষ যৌন সঙ্গীদের) বলে গিরিয়া! এই ধরনের ভাষার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক লিঙ্গ/যৌনতার মানুষদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে ওঠে, যার ফলে পরবর্তীকালে এনজিও এবং সংগঠিত আন্দোলনের বৃদ্ধির পথ খানিকটা মসৃণ হয়ে যায়।

সংগঠিত এলজিবিটি আন্দোলনের বৃদ্ধির সাথে আসে নতুন পরিচয়ের পরিভাষা, যা অনেক ক্ষেত্রেই ঢেকে দেয় এই ধুরানী-কোতি গোষ্ঠীদের ভাষা এবং পরিচয়ের সাবলীলতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাপ্পাদা নিজে ট্রান্স, (সমকামী), শিমেল (shemale), ধুরানী- বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পরিচিতি ব্যবহার করতেন। যদিও সাংগঠনিক পরিচয় রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রেই ‘সমকামী’ এবং ‘রূপান্তরকামী’ পরিচয়গুলিকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে দিতে চেয়েছে, উনি ছিলেন একাধারে দু’টোই বা একাধিক। তাঁর কাছে রূপান্তর মানে শারীরিক লিঙ্গ-পরিবর্তন ছিল না। নিজের সমকালীন ধুরানীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি ২০১২ সালে আমায় বলেন, ‘আমরা মেয়েদের মতো সাজতে ভালোবাসি... কুর্তা পড়তাম, কাজল পড়তাম!’ যদিও ওঁর কিছু ধুরানী বান্ধবীরা শারীরিক লিঙ্গ-চিহ্ন পরিবর্তন করতে চাইতেন, ওঁর ক্ষেত্রে ‘মেয়েদের মতন’ সাজতে চাওয়া মানে মেয়ে হতে চাওয়া ছিল না। ২০১৪ সালে রানাঘাট বেড়াতে গিয়ে তিনি তাঁর ধুরানী গোতিয়া (বান্ধবী/বোন) বিকাশদাকে বলেন, ‘মেয়ে তো আমরা কোনদিন আর হবো না, হতেও চাই না! আমরা হলাম শুধু মেয়েলি, মেয়েলি পুরুষ!’ আরেকদিন তিনি প্রকাশ্য স্থানে তাঁর খালি গা হতে লজ্জা পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমায় বলেন, ‘আমি যেমন শিমেল আছি... আমাদের তো সবার সামনে গায়ে জামা খুলতেও লজ্জা লাগে!’ আবার পর মুহূর্তেই তিনি নিজেকে ‘গে বড়’ (সমকামী ছেলে) হিসেবে অভিহিত করেন। ২০১৩ সালে একটি নব প্রতিষ্ঠিত এনজিওর মিটিং এ তিনি নিজেকে ‘টিজি’ (ট্রান্সজেন্ডার) বলার সাথে সাথে কথাটির প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেনঃ “আচ্ছা টিজি মানে কি সাজতে-গুজতে হবে?” বাপ্পাদার মতো ব্যক্তিদের জীবন থেকে কোতি-ধুরানী মানুষদের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র এবং লিঙ্গ পরিচয়ের তারল্য বা সাবলীলতা (fluidity, flexibility) সম্বন্ধে খানিক ধারণা করা যেতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজ স্বীকার করতে চায় না।

আসল-নকল বিভাজনের ভ্রান্ত ধারণা-

লিঙ্গ পরিচয়ের বৈচিত্র স্বীকার করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হল ‘আসল’ বনাম ‘নকল’ লিঙ্গ বিভাজনের ভ্রান্ত ধারণা। সমাজে চলতি ধারণা রয়েছে যে রাস্তায়-ঘাটে আমরা হিজড়ে ১২ পান্তরকামী মানুষদের দেখে থাকি, তাঁরা জন্মগত কোন ‘খুঁত’ বা যৌন প্রতিবন্ধকতার কারণেই ওরকম হন, আর পাঁচটা ‘সুস্থ-স্বাভাবিক’

মানুষের থেকে জন্ম থেকেই আলাদা। আদতে কিছু মানুষ অন্তর্লিঙ্গ হতে পারেন ঠিকই কিন্তু আমরা জানি যে অনেকেই অন্তর্লিঙ্গ না হয়েও চালচলন বা বেশভূষার নিরিখে লিঙ্গের দ্বৈত বিভাজন-কে লঙ্ঘন করতে পারেন। পুরুষ চিহ্নিত মানুষেরা মেয়েলি হতে পারেন বা নারী বেশে থাকতে পারেন, নারী চিহ্নিত মানুষেরা পুরুষালী হতে পারেন বা পুরুষ বেশে থাকতে পারেন। আবার কিছু মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বেশভূষা ধারণ করতে পারেন। এবং এটা এখন আর অজানা নয় যে হিজড়ে গোষ্ঠীদের মধ্যেও এই রূপ বৈচিত্র্য রয়েছে (৭)। খুব কম সংখ্যক হিজরে মানুষ অন্তর্লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জন্মানো, অনেকেই মেয়েলি কিশোর বা কোতিরাও হিজরে দলে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে কেউ পুরুষাঙ্গ অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে নির্বাণ হিজড়ে হয়ে যান, আবার কয়েকজন আকুয়া হিজড়ে মানে তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া যৌনাঙ্গ নিয়েই থেকে যান। কিন্তু সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে আসল হিজড়ে তারাই, যাদের শিল্প-যোনি কোনটাই নেই- এদের কে সমাজ দূরে সরিয়ে রাখলেও ভয় পায়, যেহেতু জৈবিক অন্তর লিঙ্গ তার সাথে নানা রকম ধার্মিক এবং সামাজিক সংস্কার জড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি পুরুষাঙ্গ নিয়েই নারী-বেশ ধারণ করেন এবং কোনভাবে সেটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে তাকে প্রকৃত ‘বৃহন্নলা’ নয়, ভেক ধারী পুরুষ হিসেবেই দেখা হয়। মানে তার লিঙ্গ অভিব্যক্তি বা মানসিক অনুভূতির দাম দেওয়া হয় না, বরং তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে তার ‘আসল’ সত্য বা সাড় হিসেবে দেখা হয়- যেটাকে বলা যেতে পারে জৈবিক সারবাত বা biological essentialism, মজার কথা হল, যারা ‘পুরুষ’ বলে চিহ্নিত কিন্তু নারী সুলভ আচরণ বা বেশভূষা ধারণ করেন, তাদেরকে হিজড়ে হিসেবে ভয় না পেলেও হিজড়ে বলে অপমান করা হয়, যেহেতু হিজড়ে তকমার সাথে নপুংসকতা অর্থাৎ পুরুষ না হয়ে উঠতে পারা বা পুরুষের থেকে খাটো হওয়ার অপমান জড়িয়ে আছে। তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ভীতি নয়, বরং অবজ্ঞা প্রাপ্য- সে সমাজে চোখে সঠিক অর্থে পুরুষ হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু সে আবার আসল হিজড়েও নয়।

এই ‘আসল/নকল’ বিচারের জন্য অনেক রূপান্তরকামী, কোতি বা হিজড়ে মানুষদের নানারকম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। এরকম অনেক খবর শোনা গেছে

যে কোথাও কোন হিজড়ে মানুষ ট্রেনে বা দোকান থেকে হিজড়ে প্রথা অনুযায়ী টাকা তুলতে গেছেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার যে পুরুষাঙ্গ আছে সেটা আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং তারপর তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়েছে বা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে (৮)। কোতি, হিজরে এবং রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীদের সাথে একজন গবেষক এবং গোষ্ঠী- সদস্য হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি নিজেও এরকম বহু ঘটনা শুনেছি। নদীয়া জেলার রানাঘাট শহরে একজন কোতি একটি হিজড়ে দলে যোগদান করেছিলেন, তিনি ট্রেনে ‘ছল্লা’ করতেন অর্থাৎ যাত্রীদের আশীর্বাদ করে টাকা চাইতেন। একদিন ট্রেনে লেডিস কম্পার্টমেন্ট এ জামাকাপড় ঠিক করতে গিয়ে কোনোভাবেই প্রকাশ হয়ে যায় যে তার পুরুষাঙ্গ আছে: তখন মহিলা যাত্রীরা একত্রিত হয়ে তাঁকে মেরে জোর করে তাঁর জামা-কাপড় খুলে দেয়, এবং তাদের মধ্যে একজন তিরস্কার করে বলে, ‘তুই মদা হয়ে এইসব করছিস, তোর লজ্জা করে না!’ অর্থাৎ যদি সে ‘আসল’ হিজড়ে হতো তাহলে তাকে তা হয়তো ক্ষমা করা যেত, কিন্তু ‘পুরুষ’ হয়ে নারী-বেশ ধারণ করা বা হিজড়ে ভিত্তি করার ‘অপরাধ’ আরো বেশি লজ্জাজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য। নদীয়া জেলা থেকে যারা বিহার এবং উত্তর প্রদেশে ‘ছল্লা’ করতে চান, তাঁদের কাছে এরকম আরেকটি ঘটনা শুনেছি: কিছু বছর আগে পাটনা থেকে মোগলসরাই লাইনে একটি চুরির ঘটনার পর রেল পুলিশ চুরির অভিযোগ দিয়ে সব হিজড়ে গোষ্ঠীর মানুষদের ধরেছিল। থানায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে বলপূর্বক নগ্ন করে দেখা হল, কে ‘আসল’ আর কে ‘নকল’। যারা পুরুষাঙ্গ থাকার দরুন ‘নকল’ প্রমাণিত হলো, তাদের শাড়ি-ব্লাউজ কেড়ে নেওয়া হলো এবং তাদেরকে গামছা পড়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, যাতে সবাই জানতে পারে তারা আসলে পুরুষ এবং সেই এলাকায় তারা আর হিজড়িবৃত্তি না করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হিজড়ে গোষ্ঠীর গুরুরাও অন্য হিজড়েদের ‘নকল’ বা ‘ভেজাল’ হিসেবে ধরিয়ে দিতে চান, যেহেতু তারা চান হিজড়ে প্রথায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কমে যাক- যদিও খোঁজে দেখলে হয়তো বেরোবে যে তাঁদের নিজস্ব ঘরেও অনেক তথাকথিত ‘ভেকধারী’ হিজড়ে রয়েছেন (৯)। আবার, এই ধরনের আরোপকে ঠেকানোর জন্য অনেক সময় হিজড়েরা কাপড় তুলে নিজেদের আসল বলে প্রতিপন্ন করতে চান- এমনকি পুরুষাঙ্গ থাকলেও সেটাকে যথাসম্ভব গোপন করে নিজেদের পরিচয় এর আসল অর্থ প্রমাণ করেন, বা বাধ্য হয়ে করতে হয়। রূপান্তরকামী যৌনকর্মীদেরও এই আসল/নকল বিচারের সম্মুখীন হতে হয়-কলকাতার রাস্তায় যৌনকর্ম করেন এমন বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি যে তাদেরকে পুলিশ হুমকি দিয়ে বলেছে, ‘আগে কাটিয়ে আয়, তারপর রাস্তায় দাঁড়াবি!’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ধ্যান ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত জৈবিক সার বাদের কারণে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও সাধারণত লিঙ্গ পরিচয় এর আসল নকল বিচার করা হয়, এবং রূপান্তরকামী বা কোতি মানুষেরা শারীরিকভাবে ‘নকল’ প্রমাণিত হলে সমাজে হিজড়েদের বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের যে খুবই সীমিত সামাজিক স্থান বা সুযোগ আছে, সেইটুকু থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হতে পারেন। যদিও ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত নালসা রায় অনুযায়ী লিঙ্গ পরিচয় স্বনির্ধারণের জন্য শারীরিক রূপান্তর অনাবশ্যক এবং শারীরিক রূপান্তরের উপর জোর দেওয়া মানে ট্রান্স বা প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা, বাস্তবে লিঙ্গ স্ব-নির্ধারণের অধিকার আদায় করার জন্য আরো অনেকটা পথ পেরোতে হবে।

উপসংহার-

যদিও সমাজে সাধারণত দু’টো কি বড়জোর তিনটে লিঙ্গ পরিচয়-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, শারীরিক লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতার নিরিখে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পরিচিতি সম্ভব, যেগুলি ‘আসল’; বা ‘নকল’ হিসেবে বিভাজন করা যায় না। হিজড়ে গোষ্ঠী ছাড়াও আমাদের সমাজে যে বিবিধ লিঙ্গ পরিচিতি রয়েছে, এই প্রবন্ধটি সেই চিত্র খুবই সীমিত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আমাদের সমাজে বা সংবাদ মাধ্যমে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ নিয়ে কথা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেই আলোচনা হিজড়ে গোষ্ঠী বা বড়জোর রূপান্তরকামী নারীদের প্রসঙ্গে গিয়েই আটকে যায়। আশা রাখবো যে মৈত্রী সংযোগের মতন গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনের নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে সেই অচলায়তন ধীরে-ধীরে ভাঙবে এবং আমরা সকল ধরনের লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতার মানুষদের সাথে নিয়ে একটি সাম্যের সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

লেখক পরিচিতি-

ডাক্তার অনিরুদ্ধ দত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত এবং ২০০৬ সাল থেকে প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের সাথে একজন গোষ্ঠী সদস্য হিসেবে গবেষণা করেছেন। এই প্রবন্ধটির কিছু অংশ পূর্বে ‘প্রান্তস্বর’ পত্রিকায় এবং ‘গুরুচণ্ডালী’ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

অন্তঃটিকা-

১) এই বিষয়ে দেখুন, রঞ্জিতা বিশ্বাস এর, “বিশুদ্ধ নারী ও বিশুদ্ধ পুরুষের ছক ভেঙ্গে”, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ এপ্রিল ২০১৪।

২) শারীরিক লিঙ্গ যে একটি সামাজিক চিহ্নিতকরণ সেই বিষয়েই মার্কিন ট্রান্স বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মী বিন স্পেডের নিন মুক্ত প্রবন্ধটি দেখতে পারেন: <http://www.deanspade.net/wp-content/uploads/2011/02/Purportedly-Gendered-Body-Part.pdf>

৩) এই বিবিধ পরিচয়গুলি সম্পর্কে আমি আরেকটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি: অনিরুদ্ধ দত্ত, ‘কোন রূপের অন্তর?’ ট্রান্সজেন্ডার ও রূপান্তরকামী পরিচয় বর্গ এবং কিছু লিঙ্গ প্রান্তিক মানুষদের আত্মপ্রকাশের ভাষা স্বীকৃতি পত্রিকা, ২০১৩।

৪) হিজড়ে জনগোষ্ঠী এবং প্রথা নিয়ে এখন ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় বেশকিছু বই বেরিয়ে গেছে যে গুলির মধ্যে উপরোক্ত তথ্যগুলি উল্লেখিত আছে যথা: অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, হিজড়ে সমাজ, দীপ প্রকাশন: কলকাতা; Gayatri Reddy, With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India, University of Chicago Press: Chicago.

৫) ‘জেনানা’ পরিচয় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে অধিক জানতে নিম্নুক্ত প্রবন্ধগুলি দেখতে পারেনঃ Ila Nagar, “The Kotis of Lucknow: an insider perspective”, Pukaar, July 2009, Issue 66; Lawrence Cohen, “The Pleasures of Castration: The Postoperative Status of Hijras, Jankhas and Academics”, in Abramson & Pinkerton (Ed.s), Sexual Nature/Sexual Culture, University of Chicago Press: Chicago. কোতি পরিচিতির বৈচিত্র্য নিয়ে দেখতে পারেনঃ অনিরুদ্ধ দত্ত, ‘কোন রূপের অন্তর?’ ‘ট্রান্সজেন্ডার’ ও রূপান্তরকামী পরিচয় বর্গ এবং কিছু লিঙ্গ প্রান্তিক মানুষদের আত্মপ্রকাশের ভাষা স্বীকৃতি পত্রিকা, ২০১৩।

৬) এই বিষয়ে দেখুন: অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, ভারতের হিজড়ি সমাজ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা; Gayatri Reddy, With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India, University of Chicago Press: Chicago.

৭) ৪ ও ৬ নম্বর টীকা দেখুন।

৮) যথা: “Four Fake Eunuchs Held for Harassing Passengers”, The Times of India, 10 July 2012.

৯) হিজড়েরা অন্য হিজড়াদের ‘নকল’ বলে আরোপ লাগানোর উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন: “ভেজাল বৃহন্নলাদের জুলুমে অতিষ্ঠ শহর”, এই সময়, ৩ মার্চ ২০১৪।

যৌনতা ও সমকামিতা বিষয়ে কিছু ধারণা, সংজ্ঞা ও শব্দের অর্থ

১। জৈবিক লিঙ্গ (সেক্স), সামাজিক লিঙ্গ (জেন্ডার) ও যৌনতা (সেক্সুয়ালিটি) কাকে বলে?

জৈবিক লিঙ্গ হল শরীরের যৌন চিহ্ন, যা চোখে দেখে বা পরণ করে কারো লিঙ্গগত পরিচয় বোঝা যায় যে ব্যক্তিটি ছেলে না মেয়ে না তৃতীয় লিঙ্গ নাকি অন্য কোনও লিঙ্গ পরিচয়ধারী।

সামাজিক লিঙ্গ হল ওই জৈবিক লিঙ্গ পরিচয় অনুযায়ী তার সামাজিক ভূমিকা, নারী বা পুরুষ হিসেবে। সমাজ কিছু কিছু আচরণ, সাজগোজ, কাজকর্ম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নারীত্ব বা পুরুষত্ব বলে স্থির করে দিয়েছে। সমাজের সেই নিয়ম অনুযায়ী মানুষের সামাজিক লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ যে জৈবিক নারী সে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী ‘মেয়েলি’ আচরণ করবে, এই মেয়েলিপনাটা তার সামাজিক লিঙ্গ। সামাজিক লিঙ্গ ব্যবস্থায় নারীত্ব আর পুরুষত্ব ছাড়া আর কিছু হয় না, এর বাইরে যারা আছে তারা হয় বাদ চলে যায়, নয় এই দুটি ভাগের কোনও একটার মধ্যে যেভাবে হোক ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়।

যৌনতা শুধু যৌনক্রিয়া নয়, এটা যৌনতার বোধ। এই বোধ শুধু জৈবিক বা শারীরিক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগগত বোধ। নিজের বিষয়ে নানা রকম উপলব্ধি, জটিল যৌন আবেগ, কিছু জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত যৌন আসক্তি, বিশেষ কোনও লিঙ্গের মানুষের প্রতি কামনা, এসবই এই যৌনতাবোধের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। আমাদের যৌন শরীর যেভাবে নানা সময়ে, নানা জায়গায়, নানা মানুষের সঙ্গে নানা ধরনের যৌনতা করে, সেইসবও যৌনতাবোধের নানা পর্যায় বলা চলে। আবার শরীরের বাইরেও যৌনতাবোধ আছে, উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্যে, কল্পনা বা ফ্যান্টাসির মধ্যে, মনন ও চেতনার মধ্যে। যৌনতাবোধ মানুষের আত্মপরিচয়ের অংশ।

একজন মানুষ যেমন শারীরিক মানুষ, মানসিক মানুষ, অনুভূতি ও আবেগ সম্পন্ন মানুষ, জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, কর্মী মানুষ, সম্পর্ক-নির্ভর মানুষ, সাংস্কৃতিক মানুষ, আত্মিক মানুষ, এবং আরও অনেক কিছু, তেমনি তিনি একজন যৌন মানুষও, তার যৌনতাবোধও তাঁর আত্মপরিচয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন মানুষ সমকামী

না বি-সমকামী না অন্য কিছু, এটা তাঁর যৌনভাবোধ এবং তাঁর আত্মপরিচয়ের বিশেষ অংশ।

২। এলজিবিটিএইচকেকিউ, এই কথার প্রতিটি অক্ষরের অর্থ কী?

এল-লেসবিয়ান বা নারী সমকামী, জি-গে বা পুরুষ সমকামী, বি বাইসেক্সুয়াল বা উভকামী, টি-ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী, এইচ হার্মোফ্রোডাইট বা হিজড়া, আই-ইন্টারসেক্স বা অন্তর্বর্তী, কে-কিন্সি বা বিচিত্রকামী বা কোতি, ও কিউ-কুইয়ার বা প্রথাবিরোধী/বহির্ভূত যৌন-লিঙ্গ পরিচয়ধারী।

৩। কুইয়ার মানে কী?

কুইয়ার এক ধরনের যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়। যেসব মানুষ তাদের যৌনতাকে ধরাবাঁধা সমকামী বা বি-সমকামী ছকে ফেলতে চান না, কিম্বা নারী বা পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের প্রচলিত ধারণার মধ্যে আটকে থাকতে চান না, সেইসব অপ্রচলিত ও অপ্ৰথাগত লিঙ্গ ও যৌনভাবোধসম্পন্ন মানুষরা নিজেদের কুইয়ার বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। কুইয়ার শব্দের সাধারণ অর্থ হল, অভূত বা কিস্তুত, যে সমাজ-সংসারে ঠিক খাপ খায় না। বিশ শতকের গোড়া থেকে কুইয়ার বলতে বোঝাত যারা বন্ধুত্ববাহীন এবং অসামাজিক যৌন আচরণ করে, তাদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুইয়ার বলা হত সেইসব মেয়েলি পুরুষদের যাঁরা পুরুষালি পুরুষদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক পাতাতেন। ১৯৯০ এর শুরুতে আন্দোলনকারীরা এই শব্দটিকে নতুন করে ব্যবহার করতে শুরু করলেন সেই সব মানুষদের বোঝাতে যাঁরা প্রথাগত যৌনতার বাইরের কোনও আচরণে বিশ্বাসী। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কুইয়ার নেশান নামে একটি আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রথাগত বি-সমকামিতার আগ্রাসী চাপে রুদ্ধ ও প্রান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেসব যৌনভাবোধ ও আচরণবোধ ও আচরণ, তাদের সবাইকে এক সঙ্গে এক ছাতার তলায় ধরার জন্য নতুন করে কুইয়ার শব্দটিকে ব্যবহার করা শুরু হয়। এই শব্দটির বিশেষত্ব হল, শুধু এলজিবিটি গোষ্ঠীর যৌনতা বুঝতেই নয়, যেকোনও প্রথাবহির্ভূত যৌন-লিঙ্গ আচরণকেই এই শব্দটি বা ধারণাটির দ্বারা বোঝা ও চিহ্নিত করা সম্ভব। এমন কী বি-সমকামী কিন্তু প্রথা-বহির্ভূত যৌনতার ক্ষেত্রেও কুইয়ার শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। আবার এলজিবিটি বা অ-বি-সমকামী যৌনতাকেও যে সব সময় কুইয়ার বলা যায় তা নয়। কারণ এই শব্দটির মধ্যে প্রথা ভাঙার বিশেষ অনুষঙ্গ

জড়িয়ে আছে। সমকামিতাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমকামী-প্রতিনিধিত্ব হতে পারে এবং বি-সমকামিতার মধ্যে প্রথা-বহির্ভূত আচরণ থাকতে পারে। এই ভাবে কুইয়ার শব্দটি সম ও বি-সম দু ধরনের যৌনতারই প্রথাগত দিকগুলিকে অস্বীকার করেছে এবং যৌনতা ও লিঙ্গবোধের আরও অনেক বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল রূপকে সামনে নিয়ে এসেছে।

৪। জেন্ডার-কুইয়ার কী?

এটি কুইয়ার বা প্রথাবহির্ভূত লিঙ্গ পরিচয়। নারী-পুরুষ, নারীত্ব-পুরুষত্ব, এই দুই ভাগে বিভক্ত জৈবিক ও সামাজিক লিঙ্গের বাইরেও যে আরও অনেক লিঙ্গ পরিচয় হওয়া সম্ভব তা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বি-সমকামী প্রথাগত নারীপুরুষের লিঙ্গ ধারণা থেকে যে সামাজিক আর যৌন আচরণ তৈরি হয়, সেই লিঙ্গ ধারণার বাইরে গিয়ে যারা নিজেদের জেন্ডারকুইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করতে চান তাঁরা জৈবিক লিঙ্গের সঙ্গে ব্যক্তির আচরণ, ব্যবহার, জীবন শৈলী বা যৌনতা, কোনও কিছুকেই যুক্ত করতে চান না। এঁরা কখনও নিজেদের একই সাথে নারী ও পুরুষ মনে করেন, কখনও নারী পুরুষের সম্মিলিত রূপ মনে করেন, কখনও নারী বা পুরুষ দু-এর অতীত বা বাইরে অন্য কিছু বলে মনে করেন, কখনও তৃতীয় লিঙ্গ মনে করেন, কখনও একই সাথে নারী-পুরুষ-তৃতীয় লিঙ্গ সবার সমাহার বলে মনে করেন, কখনও এক পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ের মধ্যে গড়িয়ে চলে যাওয়া তরল লিঙ্গ (জেন্ডার ফ্লুয়িড) বলে মনে করেন, এবং এসবের বাইরেও আরও এমন কিছু বলে মনে করেন যা বুঝিয়ে বলার মতো শব্দ এখনও আমাদের ভাষায় তৈরী হয়নি। কুইয়ার জেন্ডার-সেক্সুয়ালিটির মানুষেরা মনে করেন যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয় কে আলাদা করে বোঝা সম্ভব নয়। দুটিরই ব্যাপ্তি ও জটিলতাকে বুঝতে গেলে দুটিকে একসঙ্গে বুঝতে হবে, কারণ প্রথাবহির্ভূত জীবনচর্যা একসঙ্গে যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের অ-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

৫। হোমোফোবিয়া কী? কীভাবে তা দূর করা যায়?

হোমোফোবিয়া মানে সমকামিতার প্রতি অহেতুক আতঙ্ক। ফোবিয়া শব্দটি মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা ব্যবহার করেন যখন কোনও বিষয়ের প্রতি মানুষের আতঙ্ক যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেই অবস্থাকে বোঝাতে। সেইমত হোমোফোবিয়াও সমকামিতার

প্রতি যুক্তি-বুদ্ধিহীন অহেতুক আতঙ্ক যা মানুষকে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে, বিচার করতে, বুঝতে ও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে দেয় না। অহেতুক বলেই এটা মনের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যেখানে যুক্তি বা মানবিকতা কোনও আলোই প্রবেশ করতে পারে না। সমকামিতার প্রতি এই আতঙ্কের মূলে আছে ‘যা বা যে আমার মতো নয় সেই আমার শত্রু, সেই আমার ক্ষতি করবে’- মৌলবাদের এই ধারণা। হোমোফোবিয়া দূর করার প্রথম ধাপ হল যাঁরা এই সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, খোলামেলা আলোচনা করা, যাতে মানুষটি তাঁর আতঙ্কের কথা খুলে বলতে পারেন। দ্বিতীয় ধাপে থাকতে পারে তাঁকে বা তাঁদেরকে নিজেদের কথা বলা, সমকামিতা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া এবং কেউ যে কারো শত্রু নয়, মানুষ নানারকম হয় ও সেই বৈচিত্র্য মানবজাতির সম্পদ, প্রকৃতিই এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন- এই কথাগুলো বলার মতো জায়গা তৈরি করা। তৃতীয় ধাপে মানুষের অধিকারের কথা, সমকামী মানুষদের অধিকার ও সেই অধিকার হ্রাসের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কীভাবে বি-সমকামী মানুষেরা এই অধিকার ভঙ্গ করেন জেনে বা না জেনে, এবং কীভাবে তারা চাইলে সমকামী মানুষের এই অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এবং এই লড়াইয়ে আসলে সবার লড়াই, কারণ সব মানুষই সমাজের বা রাষ্ট্রের বা কোনও না কোনও ক্ষমতার তলায় মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়, এগুলি বুঝিয়ে দেওয়া। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ‘যে আমার মতো নয় সেই আমার শত্রু’ এই মৌলবাদী ধারণা সমকামী, বি সমকামী নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য ক্ষতিকর, এই ধারণাই বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়, ‘আমরা-ওরা’র মতো শব্দবন্ধের সৃষ্টি করে, যাতে সমস্ত মানুষজাতিরই ক্ষতি হয়।

৬। হেটেরোফোবিয়া বলে কিছু আছে কি? যদি থাকেই, তা দূর করতে গেলে কী কী করা যেতে পারে?

আগের উত্তরের সূত্র ধরে বলা যায় হেটেরোফোবিয়া হল বি-সমকামিতার প্রতি অহেতুক আতঙ্ক। কিন্তু এই আতঙ্কের পিছনে একটা কারণ স্পষ্ট বোঝা যায়। বি-সমকামী সমাজের বৈষম্যমূলক আশ্রয়নের মধ্যে থাকতে থাকতে সমকামীরা হয় নিজের যৌন চাহিদা ও প্রেমকে গিলে নেন, নয়ত এই চাহিদা প্রকাশ করে ফেলার কারণে সামাজিক বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হন। সমকামী হয়েও অত্যাচারের ভয়ে বি-সমকামী সেজে নিজের ওপর চরম হিংস্রতা করার ফলে অথবা সমকামী বলে অবমাননা পেতে পেতে সমকামী বা অ-বি-সমকামী মানুষদের মধ্যে বি-সমকামী বা

সমাজের মূলস্রোতের মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও আতঙ্কবোধ তৈরি হতে পারে। সুতরাং ফোবিয়া হিসাবে তৈরি হয়ে যাবার পর আতঙ্কটা অহেতুক হাতে পারে, কিন্তু আতঙ্কের শুরুর একটা কারণ আছে। তবুও বুঝতে হবে যে হোমোফোবিয়ার মতোই হেটেরোফোবিয়াও মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে, আমরা-ওরার তফাৎ তৈরি করে, ‘যে আমার মতো নয় সেই আমার শত্রু, সেই আমার ক্ষতি করবে’— এই মৌলবাদী ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়, যার ফলে নিজেদের বানানো ঘেটো বা বন্দিশালার মধ্যে নিজেদেরই আটকে পড়তে হয়। কাজেই হেটেরোফোবিয়ার বাইরে বেরোবারও প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে সমস্যা এই যে বি-সমকামী মানুষজন হেটেরোফোবিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটা তাদের দায়িত্ব বলে মনেই করেন না, উপরন্তু এটাকে সমকামী মানুষদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে খাড়া করেন যে এরা বি-সমকামিতার প্রতি অসহিষ্ণু। এইভাবে আবারও এই দায়িত্বও মূলত সমকামী এবং কিছু বিচ্ছিন্নতা বিরোধী অ-সমকামী মানুষের কাঁধে এসে পড়েছে, এবং আগের উত্তরের মতোই হেটেরোফোবিয়া দূর করার জন্যও খোলাখুলি আলোচনা, আতঙ্কের মূল কারণ খুঁজে বার করা, তথ্য সরবরাহ, বিভেদ কমিয়ে আনার চেষ্টা, এগুলিই করা হয় এবং কাজও হয়।

৭। ট্রান্সফোবিয়া কী? কী করে তা দূর করা যায়?

হোমোফোবিয়া বা হেটেরোফোবিয়ার মতোই ট্রান্সফোবিয়া হল ট্রান্সজেন্ডার বা ট্রান্সসেক্সুয়াল মানুষদের সম্পর্কে অহেতুক আতঙ্ক। এই আতঙ্কে ভোগেন মূলত বি-সমকামী প্রথা মেনে চলা মানুষরা কিন্তু ট্রান্স নয় এমন সমকামী বা উভকামী মানুষরাও ট্রান্সফোবিয়ায় ভুগতে পারেন। ট্রান্সফোবিয়ায় যাঁরা ভুগছেন তাঁরা ট্রান্স মানুষদের ভয় পান, ঘৃণা করেন, দূরে সরিয়ে রাখতে চান, ট্রান্স মানুষদের কোনও রকম অধিকার আছে বলে মনেই করেন না। তাঁদের অসুস্থ, বিকৃত, পাপী বা অপরাধী বলে মনে করেন। এই আতঙ্ক যেহেতু অহেতুক তাই কেন এই ট্রান্স মানুষরা সমাজে জায়গা পাবেন না, এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর থাকে না। এরা নিজের শরীরকে অস্বীকার করছে মানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করছে বা শরীর বদলে ফেলতে চাইছে মানে খোদার ওপর খোদকারি করছে, এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায়। এজন্যই এঁরা পাপী, ইত্যাদি নানান বিশেষণে ভূষিত হন।

এক্ষেত্রে একটা সমস্যা সত্যিই আছে, কারণ জেন্ডার আইডেনটিটি ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যাকে চিকিৎসাশাস্ত্র সমস্যা হিসেবেই দেখে (যে কারণে এই

ডিসঅর্ডার শব্দটিই ব্যবহার হয়) যার সমাধান হিসেবে এসআরএস (সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি) বা লিঙ্গ পরিচয় পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য অস্ত্রোপচার করার কথা বলা আছে। ট্রান্স মানুষদের সমস্যা লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় দুটি নিয়ে হওয়ার ফলে সাধারণভাবে তাঁদের বিষয়ে কম জানা থাকে আর সেজন্যই আতঙ্ক বেশি হয়। এ বিষয়ে যে সব সংগঠন বা ব্যক্তি মানুষ কাজ করছেন, অধিকারের যুদ্ধ করছেন, তাঁরা চেষ্টা করেন সাধারণ মানুষ ও অ-বি-সমকামী সম্প্রদায়ের অন্য মানুষদের কাছে ট্রান্স মানুষ সম্পর্কিত ধারণাগুলি স্পষ্ট করতে।

৮। গে-জিন বা সমকামী জিন কী?

১৯৯৩ সালে ডীন হ্যামার নামে এক বৈজ্ঞানিক তার সহকর্মীদের সঙ্গে ৭৬ জন পুরুষ সমকামী ও তাদের পরিবার বর্গ নিয়ে একটি সমীক্ষা চালান। তাতে তাঁরা প্রমাণ করেন যে সমকাম পুরুষানুক্রমিক একটা ব্যাপার এবং পুরুষ সমকামীদের বাবার দিকের থেকে মায়ের দিকে অনেক বেশি সমকামী জ্যাঠা-কাকা-মামা ও তুতো ভাইয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই আলোচনা থেকে এটা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে ক্রোমোজোমের মধ্যকার গেজিনই হল পুরুষদের সমকামী হওয়ার কারণ। এঁরা সবাই একটি দাগ ধরা ক্রোমোজোম বহন করেন। এর ফলে, সমকামকে সামাজিক কুপ্রভাব বলে চালিয়ে দেওয়ার রীতি থেকে বের করে আনা যায় যেমন তেমনই সমকাম জিনগত বলে ডাক্তারি শাস্ত্র মতে জিনের ওপর একটু কারিগরি করে সমকাম সারিয়ে দেওয়া সম্ভব এই দাবি তোলা হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী কালে কিছুতেই আর গে জিনকে খুঁজে বার করে কোনও যোগসূত্র দেখাতে পারেন না কোনও বৈজ্ঞানিকই। এই কিছু দিন আগে একদল বৈজ্ঞানিক এক রকম ছাপ আবিষ্কার করেন ডিএনএ-র ওপর, যা শুধু ভ্রূণ অবস্থায় আর জন্মের পর অল্প কিছু সময় পর্যন্ত থাকে। এই এপিজেনেটিক দাগই নাকি সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের কারণ। ফলে এঁরা এবার বললেন, সমকামকে জিনগত ভাবেও, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভাবেও, এবার তার বিশেষত্ব হল কিছুতেই তাকে বদলে সমকামকে সারিয়ে তোলা যায়, এরকম দাবি তোলার সুযোগ থাকল না।

৯। রেনবো পতাকার প্রতিটি রংয়ের গুরুত্ব কী?

যদিও রামধনু বা রেনবো-তে সাতটি রং দেখা যায়, এলজিবিটি সম্প্রদায়ের রেনবো-তে প্রাথমিকভাবে আটটি রং ছিল। প্রচলিত সাতটি রং-এর সঙ্গে গোলাপিকে জোড়া হয়েছিল। এখন গোলাপি ও ঘন নীল এই দুটি রংকে বাদ দিয়ে ছটি রং রাখা হয়েছে। সেগুলির অর্থ বা গুরুত্ব হল-

বেগুনি উদ্দীপনা, নীল শান্তি-সংহতি, সবুজ, প্রকৃতি হলুদ- সূর্যের-আলো, কমলা-শুশ্রূষা, লাল- জীবন। এগুলি ছাড়া গোলাপিকে যৌনতা আর ঘন নীলকে ম্যাজিক-এর প্রতীক বলে মনে করা হত। ১৯৭৮ সালে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরের শিল্পী গিলবার্ট বেকার এই বিশেষ রামধনু পতাকার ডিজাইন করেন।

সমকামিতা সম্পর্কে যা জানতে চান

১। সমকামিতা মানে কী ?

খুব সহজ করে বললে, কোনও মানুষ যখন সম জৈবিক লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন কামনা অনুভব করেন তখন সেই প্রবণতাকে সমকামিতা বলা যায়। মানে একজন জৈবিক নারী যদি অন্য একটি জৈবিক নারী বা নারীদের প্রতি যৌন কামনা বোধ করেন তবে তাকে নারী সমকামী বা লেসবিয়ান বলা হবে। সে ভাবে একজন জৈবিক পুরুষ যদি অন্য একজন জৈবিক পুরুষ বা পুরুষদের প্রতি যৌন কামনা অনুভব করেন তবে তাকে পুরুষ সমকামী বা গে বলা হবে। যদিও যৌন কামনা দিয়ে সম্পর্কগুলিকে বোঝানো হচ্ছে, আসলে যৌন কামনার সঙ্গে আবেগ, অনুভূতি, প্রেম, সবই জড়িয়ে থাকে। গে শব্দটি অনেক সময় সাধারণ ভাবে সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়।

২। সমকামিতার কারণ কী? কেন কেউ কেউ সমকামী হন?

ঠিক যেমন বি-সমকামিতার কোনও কারণ হয় না, তেমনই সমকামিতারও কোনও জৈবিক, মানসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক কোনও কারণ নেই। ঠিক যেমন মানুষ স্বাভাবিক যৌন প্রবণতা হিসেবে বি-সমকামী হন, তেমনি সমকামীও হন। সমকামিতার একমাত্র কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে সমলিঙ্গের মানুষের প্রেমে পড়া, তার বেশি কিছু নয়।

৩। সমকামিতা কি বংশগত?

সমকামিতাকে বংশগত বলার পিছনে কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, এমন কোনও সূত্র বা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৪। কেউ কেউ কি সমকামী হয়েই জন্মায়?

কেন কিছু মানুষ সমকামী হন, আর কেনই বা কিছু মানুষ তা হন না, এর কোনও সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক মহলই দিতে পারেননি। এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের গবেষণা হয়েছে, মানুষের জিনগত, হরমোনগত, শারীরিক, মানসিক, গঠনমূলক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব স্তরের অবস্থানকে ধরে বোঝার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোনওভাবেই বৈজ্ঞানিকরা কোনও উত্তর খুঁজে পাননি যা দিয়ে মানুষের কামনাকে বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়। অনেকেই মনে করেন যে বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবপ্রকৃতি এক সঙ্গে এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যৌন প্রবণতার জন্ম দেয়।

৫। সমকামীর কি কোনও ধরনের মানসিক বা যৌন বা হরমোনের সমস্যা ভোগেন?

সমকামীর কোনও সমস্যা ভোগেন না, কারণ সমকাম কোনও সমস্যাই নয়। যখন বিজ্ঞান সমকামীদের কামনার বিষয়টা নিজে বুঝতে পারত না তখন না জানার থেকে নানা ধরনের ভুল ধারণা তৈরি করত। আজ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র সমকামিতাকে রোগ বা সমস্যা বলে মনে করে না।

বি-সমকামিতা যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের একটা প্রক্রিয়া, মনের ভাব ও কামনা প্রকাশের একটা পদ্ধতি, সমকামিতাও তাই। এর মধ্যে বিকৃতি, অসুস্থতা, সমস্যা, অস্বাভাবিকতা, কিছুই নেই।

৬। ছোটবেলার কোনও মানসিক অসুস্থতার কারণে কি মানুষ পরে সমকামী হয়ে যায়?

না, ছোটবেলার কোনও মানসিক অসুস্থতার কারণে মানুষ সমকামী হয় না। এ বিষয়ে যত গবেষণা হয়েছে তাতে কোথাও সাইকো-প্যাথলজি (মনোরোগজনিত সমস্যা) চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। বি-সমকামিতা যেমন স্বাভাবিক যৌন আবেগ, সমকামিতাও তাই। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই নানা সময়ে, নানা দেশে, নানা সংস্কৃতিতে যৌন আচরণ হিসাবে সমকামিতা ও বি-সমকামিতা দুয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

৭। সমকামীরা কি মানসিক প্রতিবন্ধী? তাদের কি কৈশোরের পর আর মনের বাড় হয় না?

এটা একটা খুব চালু কিন্তু ভিত্তিহীন ধারণা। সমকামীরা মানসিক প্রতিবন্ধী বা মানসিক রোগী কোনোটাই নন। কৈশোর যেহেতু যৌনতার শুরুর সময় সেহেতু কৈশোরে মানুষ যৌনতা নিয়ে কৌতূহলবশত নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌনতাও তেমনই কোনও কিশোর বা কিশোরীর জীবনে কৌতূহল মেটানোর খেলা হতে পারে যা পরবর্তীকালে বি-সমকামিতায় বদলে যেতে পারে। কিন্তু শুধু তাদের উদাহরণ নিয়ে বা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সব সমকামী মানুষকে বিচার করা যায় না, বলা যায় না যে সমকামী মাত্রই কৈশোরের কৌতূহলে আটকে আছে, তাদের মনের বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। খেলাচ্ছলে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে, যা পরে বদলেও যায়, কিন্তু যাঁরা সমকামী তারা আসলে শুধুই খেলা করছেন, তাদের মনের বয়স বাড়েনি একথা কিছুতেই বলা যায় না। সমকামিতা একটি স্বাভাবিক, সুস্থ, যৌন প্রবণতা যা কৈশোরে শুরু হতেই পারে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও মানুষ সমকামী আচরণ করেন কারণ ওটাই তাঁদের স্বাভাবিক যৌন আচরণ।

কৈশোরে কোনো একটা সমকামী অভিজ্ঞতা হলে সেই মানুষটি কি বড়ো হয়ে সমকামীই হয়ে যাবেন?

কৈশোরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী জীবনের কামনার যোগ আছে এরকম কোনও বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্ক টানা যায় না। সমকামী মানুষদের সমকামী যৌন অভিজ্ঞতা জীবনের যে কোনও সময়ে হতে পারে, কৈশোরেও তা শুরু হতে পারে।

৯। সমকামিতা কি ঈশ্বরের সৃষ্টি, না এটা এক ধরনের অস্বাভাবিক বা বিকৃতি?

যদি ঈশ্বরকে মানা হয় তবে পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা ঘটছে সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যায়। যদি প্রকৃতিকে প্রাণের মূল বলে ধরা হয় তবে এ পৃথিবীতে যা কিছু জীবন্ত তাই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়। সমকামিতাও তাই ঈশ্বরের সৃষ্টি বা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে সমকামীদের মধ্যে কোনও শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি নেই।

১০। সমকামিতা কি পাপ?

পাপ শব্দটির অর্থ স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে বদলাতে বদলাতে চলেছে। মানে একটা সময়ে একটা সভ্যতায় এক দল মানুষের জন্য যা পাপ ছিল, তা অন্য যুগের অন্য সভ্যতার আরেক দল মানুষের জন্য পাপ নাও হতে পারে। এমন কী ধর্মগ্রন্থে লেখা পাপ-পুণ্যের ধারণাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। সমকামিতাকে কোনও ধর্মে পাপ বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই নিয়মে বিধবা বিবাহও পাপ, সেই নিয়মে পৃথিবী স্থির আর সূর্য তার চারপাশে ঘুরছে না মানাটাও পাপ। সুতরাং আজকের যুগের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেখলে সমকামিতাকে পাপ বলার কোনও যুক্তি থাকে না। যারা যেদিন এই পাপ-পুণ্যের নিয়মগুলো বানিয়েছিলেন, তাঁরা সেদিন সেই সময়ের যুক্তি, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, এবং বেশিরভাগ সময়েই ক্ষমতাবানের সুবিধা করে দেবার জন্য নিয়মগুলো বানানো হয়েছিলো। আজ সময় বদলেছে, সতীদাহ বন্ধ হয়েছে, বিধবা বিবাহ মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রমাণ করা হয়েছে যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আজ সমকামিতাকে পাপ বলা যাবে না কোনওমতেই।

১১। সমকামিতা কি বিদেশ থেকে আমদানি করা একটা ধারণা?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যত পুরনো সমকামিতার ইতিহাসও ততই পুরনো এবং তা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কিছুই মানেনি। যেখানে মানুষ থেকেছে, সেখানেই তার কামনার ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা যেমন বি-সমকামিতার ইতিহাস তেমনি সমকামিতারও। আর যদি আলাদা করে ভারতের সমকামিতার ইতিহাসের কথা বলতে হয় তাহলে কামসূত্র খুলে দেখতে হয়, যেখানে সমলিঙ্গের মধ্যে ঘটা কামের উল্লেখ রয়েছে, বাবরের রাজ দরবারের কথা বলতে হয় যেখানে এই ধরনের সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে, রামায়ণ ও মহাভারত দুটি মহাকাব্যের কথাও বলতে হয় যেখানে শুধু সমকামিতাই নয়, আরও নানা ধরনের অপ্রচলিত যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের কথা বলা আছে। যৌনতা এবং লিঙ্গ পরিচয় যে পরিবর্তনশীল তার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে মহাকাব্যদুটিতে। ভারতীয় তন্ত্র সাধকরা সমস্ত মানুষকে উভকামী হিসাবে দেখিয়েছেন, অর্ধনারীশ্বরের কল্পনার মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, খাজুরাহ বা কোনারকের মন্দির স্থাপত্যে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে বিচিত্র লিঙ্গ পরিচয় ও বি-সমকামিতা ছাড়াও আরও নানা ধরনের যৌনাচারের। এসবের কিছুই পশ্চিম থেকে আমাদের দেশে

আমদানি করা হয়নি, এগুলি আমাদেরই ইতিহাসের অংশ, ঐতিহ্যের অংশ, যা আমরা ভুলতে বসেছি।

১২। সৃজনশীলতার সঙ্গে সমকামিতার কোনও সম্পর্ক আছে?

সৃজনশীলতার সঙ্গে সমকামিতার কোনও সরাসরি সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে নেই। সৃজনশীলতা মানুষের এক ধরনের গুণ, সেই গুণে গুণী মানুষের যৌন পরিচয় বা প্রবণতা সম বা বি-সমকামী বা খুশি হতে পারে। ইতিহাসের পাতা খুললে কিছু সৃজনশীল সমকামী মানুষের দেখা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক সৃজনশীল বি-সমকামী মানুষের কথাও আমরা জানি। কাজেই সৃজনশীলতা আর সমকামিতার কোনও সরাসরি সম্পর্ক টানার বুদ্ধি হয় না।

১৩। সমকামিতা কি ‘শহরে ভদ্রলোকের খামখেয়াল’?

সমকামিতা এক ধরনের যৌন প্রবণতা। তার সঙ্গে গ্রাম, শহর, ভারতীয়, পশ্চিমি, গরীব, বড়লোক, শিক্ষিত, অক্ষরপরিচয়হীন এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই তার কামনা আছে, সেখানেই যেমন বি-সমকামিতা আছে, তেমনি সমকামিতা, উভকামিতা, রূপান্তরকামিতা ইত্যাদি সব কিছু আছে। আর খামখেয়াল তো কোনোভাবেই বলা যায় না। খামখেয়াল হলে মানুষ তার জীবন বাজি রেখে কামনাকে পাবার চেষ্টা করে? না পেলে আত্মহত্যা করে? খামখেয়াল হলে সমাজও কি এমন ভাবে সর্বশক্তি দিয়ে এই মানুষগুলোকে নিজেদের মতো করে বাঁচতে দেবে না বলে রুখে দাঁড়াত? রাজধানী বা বড় শহর, মফস্বল বা একেবারে গ্রাম, সব জায়গা থেকে খবর আসে এরকম মানুষরা কী ভাবে বাঁচতে চেয়ে, বাঁচার রাস্তা না পেয়ে এক সঙ্গে বা আলাদা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, কী ভাবে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি, আপনজন, সব ছেড়ে একসাথে থাকতে চেয়ে পালায়, ধরা পড়লে পুলিশের নির্যাতন, কিংবা পাচারকারীর হাতে পড়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া, কোনও কিছুকে পরোয়া করে না। -এসব কিছুকে শহরে খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

১৪। সমকামীরা কি অপরাধপ্রবণ?

মানুষ অপরাধ করে, সেই মানুষদের মধ্যে কারো যৌন প্রবণতা বি-সমকামী, কারো সমকামী বা অন্য কিছু। আলাদা করে সমকামিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার কোনও যোগ নেই, যেমন বি সমকামিতার সঙ্গেও অপরাধপ্রবণতাকে সরাসরি জোড়া যায় না। এধরণের প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতেই থাকে; কখনও মনে হয় সমকামীরা সৃজনশীল, কখনও অপরাধপ্রবণ। আসলে যে বিষয়গুলিকে আমরা বুঝতে পারিনা সেগুলো নিয়ে মনের মধ্যে ভয় আর ভক্তি দুটোই যুক্তিহীন ভাবে চেপে বসে। যে কোনও ধরনের যৌন কামনা কেন সৃজনশীলতাই তৈরি করবে, আর কেনই বা অপরাধপ্রবণতা? যৌনতার একটা অংশ কামনা, তা যার দিকেই যাক না কেন, তা দিয়ে মানুষ বিশেষ করে ভাল বা মন্দ কিছুই হয় না। সমকামিতা বা অ-বি-সমকামিতাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১৫। আমাদের দেশে কতজন সমকামী আছে?

এটা কিছুতেই বলা সম্ভব নয়, কারণ কোনও জনগণনার সময় 'সমকামী না বি-সমকামী' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। যদি প্রশ্নটা থাকত তাহলেও পরিসংখ্যান ভুল হত, কারণ আমাদের সমাজের প্রতিকূলতায় কেউ কি সাহস করে নিজেকে সমকামী বলে দেখাতে চাইতেন? এখনও এ দেশে যত সমকামী বা অ-বি-সমকামী মানুষ আছেন, তাঁরা বেশিরভাগই নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে চলেন কাজেই সঠিক তথ্য পাবার কোনও উপায় নেই।

১৬। সমকামীরা কবে বা কখন তাঁদের এই প্রবণতা বুঝতে পারে?

এর কোনও একক উত্তর হয় না। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় নিজেকে যৌন মানুষ হিসেবে চিনতে শুরু করেন। অনেকে কৈশোরেই নিজের যৌন প্রবণতার কথা বুঝতে পারেন, আবার প্রথমে যার যে প্রবণতা হয়, পরেও যে তাইই থেকে যাবে এমনও নয়। কাজেই কেউ হয়ত জীবনের অর্ধেকটা সময় বি-সমকামী হিসেবে কাটিয়ে দেওয়ার পর একদিন বুঝতে পারেন যে তিনি সমকামী, বা এর উল্টোটাও হওয়া সম্ভব।

১৭। সমকামীরা কি বদলায়, না কি তারা সারা জীবনই সমকামী থেকে যায়?

আগের উত্তরেই বলা হয়েছে, যে যৌন প্রবণতা পরিবর্তনশীল, কাজেই আজ যে বি-সমকামী কাল সে সমকামী হয়ে যেতেই পারে এবং এর উল্টোটাও হওয়া সম্ভব। অনেক মনস্তত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে আসলে সব মানুষই উভকামী, কাজেই যে কোনও সময় যে কেউ সম বা বি-সমকামী আচরণ

করতেই পারেন। এই হিসেবে দেখলে সমকামীর বদলে অন্য কিছু হয়ে যেতেও পারেন। যেটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে সেটা হল, এই যাবতীয় বদল কিন্তু আপনা থেকে ঘটা, বা স্বেচ্ছায় ঘটানো বদল। জোর করে কোনও অবস্থাতেই কোনও সমকামীকে বি সমকামী বানানো যায় না। যেমন কোনও বি-সমকামী মানুষকে কিছুতেই সমকামী করে তোলা অসম্ভব।

১৮। সমস্ত সমকামী সম্পর্কই কি শুধু যৌনতা নির্ভর?

সমকাম বা বি সমকাম শব্দগুলির মধ্যে যখন ‘কাম’ অংশটা রয়েছে তখন ‘কাম’-কে বাদ দিয়ে সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ যৌনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছে এটা ধরে নিতে হবে। কিন্তু ঠিক যেমন বি-সমকামিতা মানে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যৌনতা নয় শুধু, তেমনই সমকামিতা মানেও সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌনতা নয় শুধু। আবারও মনে হয় ভেবে দেখার দরকার আছে যে এই ধরনের প্রশ্ন কেন আমাদের মনের মধ্যে আসে। প্রতিটি বি-সমকামী মানুষ নিজের মত করে কত রকম আবেগ, মায়া, স্নেহ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, নির্ভরতা, দায়িত্ব- এই সব বাঁধনে সম্পর্ককে বেঁধে রাখেন। প্রত্যেকে জানেন যে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে যৌনতা যেমন আছে, আরও আরও এত কিছুও তেমনই আছে বলেই সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু সেই মানুষরাই মানতে নারাজ সে এত কিছুই সমকামী সম্পর্কেও থাকে, তবে তা পূর্ণতা পায়। কারণ তাঁরা সমকামিতা কী তা ভাল ভাবে জানেন না। আশা করব এই বইটি তাঁদের সেই জানার সুযোগ করে দেবে। কোনও কোনও বি-সমকামী সম্পর্ক যেমন শুধু যৌনতা নির্ভর হতে পারে, তেমনই কোনও একটা সমকামী সম্পর্কও শুধু যৌনতাকে নিয়ে থাকতে পারে। তাদের দিয়ে সামগ্রিক সমকামিতা বা বি-সমকামিতা কোনোটারই বিচার করা যায় না।

প্রান্তিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন

অনুপম মিত্র

(সহকারী অধ্যাপক, ফাউন্ডার Coochbehar Mind

Zone counselling centre)

গুরুত্বই আলোচনা করব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে খুব সহজভাবে বললে বলতে হয় যারা সমাজে থেকেও সমাজের প্রান্তে অবস্থান করে, প্রান্তিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দলের প্রান্তে সরিয়ে রাখে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়। এটি একটি প্রচলিত সামাজিক ঘটনা যার দ্বারা এইরকম কোন উপদলকে সামাজিক কোনো ব্যাপারে বা যোগদানে বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের চাহিদা এবং ইচ্ছেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রান্তিককরণের সেই অর্থে কোন সর্বসম্মত সঙ্গে আমরা খুঁজে পাই না তবে ই এফ এ গ্লোবাল মনিটরিং ইউনেস্কোর বিবরণী 2010 সালে বলা হয়েছে, ‘a form of acute and persistent disadvantage rooted in underline social inequalities’, অর্থাৎ সামাজিক ও অসমতার কারণে সমাজের যে অংশ চূড়ান্ত এবং স্থায়ী অসুবিধার মধ্যে জীবন যাপন করে তাদেরকেই আমরা প্রান্তে জনগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করতে পারি। সমাজের বরাবর অবহেলিত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা। অথচ তাদের নিয়ে জনমানসে কৌতুহল এর শেষ নেই। সমাজের একাংশ এখনও হোমো ফোবিক। মূল ধারার স্রোত থেকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা এখনও বিচ্ছিন্ন।

এখনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত তারা অবস্থান করে, সমাজের এক প্রান্তে তাদের অবস্থান। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনতার এত দিন কেটে গেলেও মন মানসিকতার পরিবর্তন কতটা হলো সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আসলে আমরা যা দেখে অভ্যস্ত তার বাইরে মন কে পরিবর্তন করতে চাই না, চাই না দৃষ্টিভঙ্গি কে পরিবর্তন করতে। লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে তারতম্য করি, যা দেখি, যা শুনি তাকে ধরে এগিয়ে চলি। সহজ কথায় আউট অফ দা বক্স ভাবতেই চাই না।

সামাজিক রীতিনীতি এবং আদর্শ ধারায় মূলত জেন্ডার অথবা পুরুষ বা মহিলাদের আচরণ নির্দিষ্ট করা হয় পুরুষ বা মহিলারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করবেন বা তাদের থেকে কি ধরনের প্রত্যাশা করা হবে তার সামাজিক আদর্শ তারাই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নির্ধারণ করি বৈচিত্র্য দেখা যায়। জেন্ডার কিন্তু কোন ব্যক্তিগত

বৈশিষ্ট্য নয় একটি সামাজিক বিষয় এটি হল সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণী বিভাজন।

কিন্তু শরীর আর মন দুই যদি এক না হয়, যদি তাদের মধ্যে বিরোধ হয়, সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়, শারীরিক ভাবে সে ছেলে কিন্তু মানসিক ভাবে সে মেয়ে, আবার অপর দিকে শারীরিক ভাবে সে মেয়ে কিন্তু মানসিক ভাবে সে ছেলে। অর্থাৎ মন আর শরীরের বিরোধ, আসলে মন তো তার মতো করে বিচার করে প্রত্যেকটি বিষয় কে, নিজেকেও অপরদিকে শরীর এর তার মতন করে চলে। এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে যার সঙ্গে ঘটেছে সে নিজে, সঙ্গে যুক্ত হয়, সামাজিক চাপ, কারণ আমরা তো চেনা বৃত্তের বাইরে বের হতে চাই না, যা দেখি যা শুনি সেই ভাবেই মন কে নির্মাণ করি, ছেলেরা তাদের মত হবে মেয়েরা তাদের মত হবে, 'মতো' নিয়ে যত গভগোল, ফলস্বরূপ যাদের শরীর ও মন দুই দিকে চলছে তাদের 'মতো' এর মতো সংজ্ঞায় তাদের আবদ্ধ করা যায় না। এরফলে তাদের নানা রকম সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় খুব প্রাথমিক পর্বে তাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হল বুলিং এবং এই বুলিং-টিজিং এর ফলে তাদের অনেক সময় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তুই এর মতন না কেন ওর মতন না কেন এই যে চিরাচরিত কিছু বিষয় যেটা কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদের প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে যার ফলে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে অনেক সময় তাদের নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যকে পরিচর্যা করার জন্য যে প্রয়োজনীয় পন্থাগুলি রয়েছে তা অনেক সময়ই গ্রহণ করতে পারে না ফলে তাদের এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং নানাবিধ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যদি এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে আমরা যদি একটুখানি সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই তবে কিন্তু বিষয়টা অনেকটা সহজ হয়ে যায় বিশেষ করে তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে যারা পড়ে তাদের যদি আমরা একটুখানি সহানুভূতি দৃষ্টিতে দেখি আমরা অধিকাংশ সময়ে তাদের হয় ভিনগ্রহের প্রাণী অথবা আলদা ধরণের মানুষ অথবা এই ধরনের কিছু নাম দিয়ে আমরা তাদের আখ্যায়িত করতে চাই কিন্তু বিষয়টা কিন্তু তা নয় এবং শরীর ও মন দুই কক্ষপথে চলার দরুন তাদের এই কষ্ট।

মানসিক স্বাস্থ্য-কে রক্ষা করা তাকে যত্ন করা প্রয়োজনীয়। সহজভাবে সকলকে গ্রহণ করা, বোধ ও মনন-কে গুরুত্ব দেওয়া, সকলের প্রতি সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বোধ বাড়িয়ে দেওয়া এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের যদি আমরা একটু সহযোগিতার চোখে দেখি যদি একটু সহমর্মিতার

লিঙ্গ পরিচয়ের গোঁড়ার কথা

চোখে দেখে যদি তাদের উদ্দেশ্যে কু-মন্তব্যের বদলে যদি আমরা বাড়িয়ে দিই সাহায্যের হাত তবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যতটা ভালো লাগবে ততটা ভালো কিন্তু আমাদেরও লাগবে। কারণ কেউ সমাজের বাইরে নই, সকলেই পাশাপাশি আছি, দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়, তাদের প্রান্তিকীকরণ নয় বরং তাদের সামাজিক মূল স্রোতে নিয়ে আসবার জন্য যদি নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় সরকারি এবং বেসরকারি এবং স্ব-উদ্যোগে তাহলে কিন্তু সকলের জন্য সেটা যথেষ্টই ভালো এবং ভালোলাগার জায়গা তৈরি করবে। উদ্যোগ শুরুর পূর্বে যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যদি দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পরিবর্তন করা যায় তবে কিন্তু আমরা সমাজটাকেও পরিবর্তন করতে পারবো। নেতিবাচক নয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে সমাজ পরিবর্তনের ভালো কিছুকে গ্রহণ করতে হবে তবে সার্বিক সর্বাঙ্গ সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে সকলকে নিয়ে।

"If you can dream it you can do it"

-Walt Disney.



মৈত্রীসংযোগ সোসাইটির যোগাযোগ-

বসারহাট বাজার, কোচবিহার

ফোন নম্বর- 7063418696

ইমেইল- moitrisanjog2011@gmail.com

Website- www.moitrisanjog.in

ব্রহ্মা